প্রশ্ন ১ বাংলার লৌকিক সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? ৫

উত্তর › বাংলার লোকসংস্কৃতি সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত—(ক) লোকসাহিত্য, (খ) লোকশিল্প, (গ) লোকধর্ম। এই তিনটি বিভাগ ছাড়াও এর পরিধি সুবিস্তৃত। লোকসাহিত্য আসলে মৌখিক শিল্প। ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সূত্রায়িত করেছেন—(১) কৃষিনির্ভর গ্রামকেন্দ্রিক সমাজের সৃষ্টি, (২) মৌখিক ভাষানির্ভর অলিখিত রূপ, (৩) ঐতিহ্যমূলক সমষ্টিগত প্রকাশ, (৪) ব্যক্তিগত পরিচয়হীন অনির্দিষ্ট রচনা এবং (৫) নমনীয় ও পরিবর্তনশীল প্রবাহ। লোকসাহিত্যের রয়েছে নানান রূপ রূপান্তর গদ্য, পদ্য, ও উভয়ের সমন্বয়ে রচিত লৌকিক নাটকরূপে এর বিস্তার। লোকসাধারণের আস্থা বিশ্বাস, পুরাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষা, মনস্তত্ব, মূল্যবোধ, সংগ্রাম, আচার-আচরণ সব কিছু নিয়েই লৌকিক সাহিত্য, আসলে লোকমনের দুঃখবেদনা, আশানিরাশা নিয়েই সাহিত্য বর্ধিত হয়। লোকসাহিত্যের তিনটি পরম্পরা—(ক) গদ্যে রচিত লোকসাহিত্য যেমন, লোককথা—যার অন্তর্গত হল ব্রতকথা, পশুকথা, রূপকথা, কথকতা প্রভৃতি। (খ) পদ্যে রচিত লোকসাহিত্য যেমন—ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গীতিকা প্রভৃতি। (গ) গদ্য পদ্যে মিশ্রিত লোকসাহিত্য, যেমন লৌকিক নাটক। লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির অবস্তু নির্ভরতাভিত্তিক লোকজীবনের মননের প্রকাশ, যা সৃষ্টি হয়ে মুখে মুখেই প্রসার লাভ করে। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তার জন্ম এবং বিস্তার। আবার এর বিপরীত মন্তব্যও রয়েছে, যেমন গ্রামে যা রচিত হয় তাকেই লোকসাহিত্যের রচনা রূপে স্বীকার করা যায় না। কারণ লোকসাহিত্যও একটি সংহত সুসামঞ্জস্য সমাজের সৃষ্টি, কেবলমাত্র নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত সৃষ্টিই লোকসাহিত্য নয়, বরং বলা যেতে পারে, লোকসাহিত্য সমগ্র সমাজ মানসের প্রতিফলন।

লোকসাহিত্যকে সমষ্টিগত সমাজের অলিখিত প্রকাশ বলে মনে করা হলেও আধুনিক বিবর্তনমুখী সমাজ বিকাশের ধারায় একেও লিখিতরূপ বিশিষ্ট এবং ব্যক্তিমূলক রচনা বলে লোকবিশেষ জ্ঞান-মত প্রকাশ করেন। দলে লিখিত অলিখিত কিংবা ব্যক্তি ও সমষ্টির প্রতিফলন লোকসাহিত্য তথা লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হতে পারে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লোকসাহিত্য' (১৩১৪) গ্রন্থে লোকসাহিত্য সম্পর্কিত চারটি প্রবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়—(ক) ছেলেভুলানো ছড়া, (খ) ছেলেভুলানো ছড়া-২, (গ) কবিসংগীত,

Scanned with CamSc

(ঘ) গ্রাম্যসাহিত্য। তার থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে লোকসাহিত্য মুকুলিত হতে থাকে লোকজীবনে, লোকসমাজে। সমাজব্যবস্থার ব্যাপকতম পরিবর্তন সাধিত হলে তা বয়ে চলে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো সমাজ মানসে। কারণ এর প্রাণ প্রবাহ সমাজের গভীরে প্রোথিত।

প্রশ্ন ২ বাংলার ছড়াচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করো।

উত্তর লোকসাহিত্যের বিষয় বৈচিত্র্যে ছড়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছড়া পদ্যনির্ভর লোকসাহিত্য, যা লোকসমাজের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে জীবনচর্চার সূত্র ধরে। এগুলি অন্ত্যমিল যুক্ত দুই, চার, ছয় বা আটটি চরণে নির্দিষ্ট। কবিতা পাঠের লয়ের যে ত্রিসূত্র-ধীর লয়, মধ্য লয় এবং দ্রুত লয় আছে, তার মধ্যে ছড়া সবসময় দ্রুত লয়ের ছন্দ। যার পর্বের আদিতে একটি প্রবল জোর বা প্রস্বর পড়ে যাকে শ্বাসাঘাত বলে। ছড়া আসলে দ্রুত লয়ের স্বরবৃত্ত ধর্মী এক ছন্দ বিশেষ, যাকে বলে ছড়ার ছন্দ। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়—

|/ | | | |/ | | | |/ | | | |/

কে মেরেছে / কে ধরেছে / কে দিয়েছে / গাল ৪+৪+৪+১

|/ | | | |/| | | |/ | | | |/

তাই তো খুকু / রাগ করেছে / ভাত খায় নিকো / কাল ৪+৪+৪+১

বাংলায় ছড়াচর্চার পথিকৃৎ হলেন শ্রী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি 'ছেলেভুলানো ছড়া' (১৯০৫) নামে প্রথম ছড়ার সংকলন প্রকাশ করেন ও গ্রন্থমধ্যে ২৫২ টি ছড়া সংকলিত হয়েছে, যার মধ্যে পাঁচ রকমের ছড়া রয়েছে—(১) আদরের ছড়া ৯০ টি, (২) ঘুমের ছড়া ২৮ টি, (৩) খেলার ছড়া ১১ টি, (৪) বিয়ের ছড়া ৩০টি, (৫) বিবিধ ছড়া ৯৩ টি। এরপর ব্রজসুন্দর সান্যাল, তাঁর দীর্ঘ ছড়াটির নাম 'শরৎকালী' যার মধ্যে বাংলাদেশের পুরাণ নির্ভর জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়েছে। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রমুখ ছড়া সংগ্রাহক রূপে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রায় বেশ কিছু ছড়া নিয়ে 'খুকুমণির ছড়া' সংকলিত করেন। আসলে সংকলিত ছড়াগুলি লোকসমাজের অন্তর্নিহিত সত্তা বিশেষ। উৎসগত বিচারে সাধারণত ছড়া চার প্রকারের হতে পারে—(১) আচারধর্মী ছড়া, (২) উপদেশমূলক ছড়া, (৩) বিনোদনপন্থী ছড়া, (৪) ছেলেভুলানো ছড়া। 'লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে অনিমেষ কান্তি পাল লৌকিক ছড়ার তিনটি শ্রেণিকরণ করেছেন।

(১) অনুষ্ঠানধর্মী ছড়া—ব্রতের ছড়া, মন্ত্রতন্ত্রের ছড়া, বিয়ে, সামাজিক অনুষ্ঠানভিত্তিক ছড়া, উদাঃ-পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা—ব্রতধর্মী ছড়া।

(২) শিক্ষামূলক বা উপদেশাত্মক ছড়া—সামাজিক ছড়া, ডাকের বচন, খনার বচন, উদাঃ—"খনা বলে ডেকে আন / রোদে ধান, ছায়ায় পান—খনার বচন।"

(৩) শিশুদের জন্য ছেলেভুলানো ছড়া—ঘুমপাড়ানি ছড়া, কান্না নিবারণকারী ছড়া। উদাঃ—ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুম দিয়ে যায়।—ঘুমপাড়ানি ছড়া।

ছড়াগুলির নানান পাঠান্তর বা রূপান্তর থাকলেও শিশুসলভ চিরন্তনতা এর প্রাণধর্ম। ছড়ার মধ্যে চিত্ররূপময়তা বর্তমান, প্রত্যেকটি ছড়ায় অগণিত চিত্রের সমন্বয়। সেই চিত্রধর্মিতা অসংলগ্ন হতে পারে, কিন্তু তা স্বাভাবিক লোকসমাজ মন্থনজাত। রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে দিয়ে আদিম সৌকুমার্য প্রত্যক্ষ করেছেন, যাকে বাল্যের রস বলে অভিহিত করেছেন, যা তীব্র নয়, গাঢ় নয় তা অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং সরস ভাবনা দ্বারা সঞ্জীবিত। 'সাহিত্য পরিষদ' পত্রিকায়, তৃতীয় সংখ্যায় ১৩০২ বঙ্গাব্দ 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় একটি গ্রন্থ সংকলন করেন—

"পুটু যদি রে কাঁদে।
আমি ঝাঁপ দেবরে বাঁদে।।"

'হাসিখুশী'র জনপ্রিয় কবি যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'খুকুমণির ছড়া' ১৮৯৯ সংকলিত করেন। এতে মোট ৪১০ টি ছড়া সংগৃহীত হয়েছে। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'পল্লীকথা' প্রবন্ধ, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লী বৈচিত্র্য' গ্রন্থ, অক্ষয়কুমার সরকারের 'বাঙালীর মেয়ের ব্রতকথা' নামক নিবন্ধ প্রভৃতি রচনায় বাংলা ছড়ার উল্লেখ আছে।

Scanned with CamSc

তা ছাড়া 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ', 'সাধনা', 'প্রতিভা', 'সাহিত্য', 'বিচিত্রা', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'জনতার মুখ', 'ছত্রাক', 'সম্প্রতি', 'শিশুমেলা', 'সমাজশিক্ষা', 'বৈদগ্ধ্য', 'লিপিকা', 'শিস', 'কৌশিকী' প্রভৃতি পত্রিকায় বাংলা ছড়ার সংকলন ও প্রাবন্ধিক আলোকপাত করেছেন। লৌকিক ছড়া সারা বাংলাদেশে লোকজীবনের সুগভীর মরমিয়া বোধ, জীবনের সংকট, আনন্দ বেদনা, লোকায়ত বিশ্বাস, ইতিহাস প্রসঙ্গ, শিশু মনস্তত্ত্বের মান-অভিমান, পালা-পার্বণ, ব্রতকথার উল্লেখ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান।

প্রশ্ন ৩ ধাঁধা কী? বাংলা লৌকিক সাহিত্যে যে বিভিন্ন প্রকার ধাঁধার উদাহরণ লক্ষ করা যায় তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর > ধাঁধা শব্দটির উৎস সংস্কৃত শব্দ 'ধন্ধ'। যার অর্থ কৌতুকময় বুদ্ধিদীপ্ত কূট প্রশ্নচ্ছলে জানার আকাঙ্ক্ষা। ইংরেজিতে যাকে বলে 'riddle'। একে হেঁয়ালিও বলা হয়। লোকসমাজের প্রাত্যহিকী, প্রশ্নচ্ছলে উত্তরদানের প্রচেষ্টায় লোকশিক্ষার একটি অন্যতম প্রধান উপায় হল ধাঁধা। এর মধ্যে সরাসরি উত্তর মেলে না, আকারে, আভাসে, ইঙ্গিতে বুদ্ধির চকিত উদ্ভাসে উত্তর মেলে। ধাঁধার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন,—"যাহা হঠাৎ সহজে বুঝা যায় না একটু ভাবিতে হয়, যাহার জন্য একটু মাথা ঘুরাইতে হয় তাহাই ধাঁধা।" ধাঁধাকে হেঁয়ালি, প্রহেলিকা, নানা নামে অভিহিত করা হয়। গ্রাম্য উচ্চারণে একে পঁই, পোলাই প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করা হয়। আশুতোষ মিত্র হেঁয়ালির সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করেছেন—"যাঁহার আপাতত একটি অর্থ, প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্য অর্থ। এইরূপ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুইটি অর্থ আছে, অথবা কতকগুলি পদবিন্যাস যাহার অর্থের জন্য ধোঁকা দেওয়া হয়, এইরূপ গদ্য বা পদ্য লিখিত প্রশ্নকে হেঁয়ালি বা সমস্যা বলা হয়।" ধাঁধা মানে কুইজ নয়, যে প্রশ্নে নিগূঢ় ব্যঞ্জনা রহস্যময়তা আর চাতুর্যের শৈল্পিক পরিচয় থাকবে তাই ধাঁধা। আর সমস্ত প্রশ্নই হবে লোকজীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। এককথায় একটি মাত্র ভাবকে রূপকের আশ্রয়ে প্রশ্নচ্ছলে প্রাতিপাদ্য করা হয়, এমন কৌশল চাতুরিমাই ধাঁধার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এর উত্তর খুঁজতে হলে লাগে বুদ্ধিমত্তা মিশ্রিত রসবোধ, চিন্তা মননের সুতীক্ষ্ণ অভিনিবেশ, সমাজ পরিবেশ সম্পর্কিত সুগভীর জ্ঞান ও মানবজীবন বিষয়ে সগভীর অন্তর্দৃষ্টি। তবে ধাঁধার অন্তরালে এত বৌদ্ধিকতা থাকলেও গ্রাম্যজীবনের নিরক্ষর মানুষের কাছে তা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়। তারা বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতায় এসব ধাঁধার উত্তর খোঁজে। সর্বোপরি হাস্যরসের আধার ধাঁধা।

ধাঁধাগুলি একটি নির্দিষ্ট নিয়মে গাণিতিক বিচারবিশ্লেষণ হৃদয় সংবেদ্য হয়ে ওঠে। সে কারণে 'লোকধাঁধা' বিশেষজ্ঞ অমল কে ভৌমিক 'লোকশ্রুতি' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে গাণিতিক ধাঁধাগুলিকে দশটি ভাগে ভাগ করেছেন। (১) দৈনন্দিন জীবন কেন্দ্রিক, (২) বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পর্কিত, (৩) সাংকেতিক সহযোগী, (৪) লৌকিক গণিত চর্চা, (৫) সংখ্যা নির্ণায়ক, (৬) গাণিতিক সমীকরণের, (৭) গাণিতিক একক সম্বন্ধীয়, (৮) জ্যামিতিক, (৯) লোক ঠকানো ও (১০) বর্ণ সংক্রান্ত।

ধাঁধা এক প্রাচীন সম্পদ এবং এর গুরুত্ব লোকসাহিত্যের যে-কোনো সম্ভার থেকে কম নয়। সমাজজীবনের ব্যস্ততা, জটিলতা, অর্থাৎ নগর সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এর চর্চা হয়তো কিছুটা কমেছে কিন্তু হারিয়ে যায়নি। ধাঁধার মধ্যে বাংলাদেশের সমাজজীবনের নানা ঘটনা, বিষয়, অনুষ্ঠান, পুরাণ, ইতিহাস, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, লোকাচার, সংস্কৃতি হাস্যপরিহাস, কবিত্ব সহযোগে তুলে ধরা হয়েছে। এককথায় সমাজ সংস্কৃতির এমন কোনো বিষয় নেই যা ধাঁধার মধ্যে চিত্রিত হয়ে ওঠেনি। লোকজীবনে ধাঁধা মুকুরিত হয়ে আছে দৈনন্দিন জীবন চর্চায়, আনন্দানুষ্ঠানে, পালা-পার্বণে, অবসরবিনোদনের প্রত্যেক মুহূর্তে। সর্বোপরি ধাঁধা রহস্যময়তার জটিল আবর্তেই কৌতুকরসের স্নিগ্ধতায় শ্রোতা-পাঠকের মনে আনন্দ উপলব্ধি ঘটায়।

প্রশ্ন ৪ প্রবাদ কাকে বলে? বৈশিষ্ট্য সহকারে প্রবাদের আলোচনা করো।

উত্তর > বাংলার লৌকিক সাহিত্যের জগতে প্রবাদ সর্বপ্রাচীন। সমাজজীবন সিক্ত অভিজ্ঞতা, আচার-আচরণ, মানুষের অন্তরের সূক্ষ্মতা, এমনকি নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে জাতিগত ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যও প্রবাদের মধ্যে প্রতিভাত হয়। সর্বোপরি প্রবাদ হল বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন। 'প্রবাদ' বলতে বোঝায়—"A proverb is a short Sentence based on a long experiences". প্রবাদের গঠনগত রূপও বৈচিত্র্যময়, পদ্য বা

Scanned with CamSc

গদ্য উভয় শ্রেণির ছত্র বা বাক্য নিয়ে তার বিস্তার। প্রবাদ মানেই যেন একটা চিরকালীন শাশ্বত অভিজ্ঞতা বা বক্তব্যের ঐতিহ্যের অনুরণন, যা মানুষকে স্মৃতিচারী করে, ঐতিহ্যানুগত পথে ভাবীজীবন অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সর্বোপরি প্রবাদ লোক অভিজ্ঞতা সঞ্জাত, সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনা।

মার্কিন প্রবাদ বিশেষজ্ঞ আর্চার টেলর প্রবাদের ছয়টি বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন—(১) সত্যতা, (২) চিরন্তনতা, (৩) সংক্ষিপ্ততা, (৪) বুদ্ধিদীপ্ততা, (৫) স্মরণযোগ্যতা, (৬) সমাজ অভিজ্ঞতা। প্রবাদের একটা দ্যুতি আছে যা আমাদের পথ দেখায়, আলোকিত করে। প্রবাদ হল সংক্ষিপ্ত অথচ সংহত বক্তব্য যা জনমনে বহুল কথিত ও প্রচারিত, যা সত্যকে প্রতিস্থাপিত করে, ব্যাখ্যা করে। মানবসমাজের সাধারণজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান নির্ভর প্রবাদ, যা তৈরি হয় মানুষের অভিজ্ঞতায় গান থেকে, গল্প থেকে।

আমাদের সমাজজীবনের গভীরে নানান প্রত্যয়, জিজ্ঞাসা, ব্যবহার, অনুশীলন এককথায় সংস্কৃতির প্রকাশ হল প্রবাদ। বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের ব্যাপ্তি আর বিশালতার বৈচিত্র্য নিয়ে প্রবাদ বিরাজিত। বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক কালাবধি সাহিত্য সৃজকেরা তাঁদের সৃষ্ট শিল্পে প্রবাদ চয়ন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বেশ কয়েকটি প্রবাদ উদ্ধৃত করা হল—

(১) "আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী।" (চর্যাপদ)
(২) "হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।" (চর্যাপদ)
(৩) "শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথা বাঁধিবি তাগা।" (কৃত্তিবাস)
(৪) "কুপুত্র হইলে মা না হয় বিমুখ।" (কবিকঙ্কণ)
(৫) "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।" (ভারতচন্দ্র)
(৬) "পাকা ধানে মই।" (রামপ্রসাদ) প্রভৃতি।

কেবলমাত্র দৈনন্দিন জীবনচর্চায় নয়, সাহিত্যের নানা শাখায় এবং পর্বে প্রবাদের প্রয়োগ বাঙালির ভাব ও ভাষাকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। অনেকক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রবাদগুলি বাংলার প্রবাদে পরিণত হয়েছে। যেমন—'শুভস্য শীঘ্রম্', 'মধুরেণ সমাপয়েৎ', 'গতস্য শোচনা নাস্তি' প্রভৃতি। অনেকক্ষেত্রে পৌরাণিক চরিত্র, ঘটনা, কাহিনি কেন্দ্রিক প্রবাদ প্রচলিত আছে—'একা রামে রক্ষা নেই', 'সুগ্রীব দোসর', 'ঘরের শত্রু বিভীষণ', প্রভৃতি। সবশেষে বলা যায় প্রবাদ হল অত্যন্ত বাস্তব সমন্বিত জ্ঞান ও সাহিত্যকলার অপরূপ নিদর্শন।

Scanned with CamSc